ইউনিট - ৭

জাতীয় শক্তি, জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা

National Power, Nationalism and Liberty

ভূমিকা :

জাতীয় শক্তি, জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা এ বিষয়গুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কেননা, এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির পূর্ণতা সম্ভব নয়। জাতীয় শক্তি যেমন জাতীয়তাবাদের প্রাণ, তেমনি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাতীয় শক্তির বিকাশের জন্যে অপরিহার্য। অন্যদিকে, জাতীয় শক্তি ও জাতীয়তাবাদী চেতনা জাতীয় স্বাধীনতার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। আর জাতীয় স্বাধীনতা টিকে থাকে জাতীয় শক্তির কারণে। শক্তিহীন কোন জাতি তার স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে পারে না। কাজেই, এ তিনটি বিষয়ের একটিকে অপরটি হতে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না।

জাতীয় শক্তির উপর কোন দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থান ও বৈদেশিক ভূমিকা নির্ভর করে। যে দেশ জাতীয় শক্তির দিক দিয়ে যতো অগ্রসর, সে দেশ ততো উন্নত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ও প্রভাব ততো বেশি। জাতীয় শক্তির সাথে জাতীয় মর্যাদাবোধ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার বহি:প্রকাশ নির্ভর করে। যেসকল জাতি দুর্বল তারা সব সময়ই রক্ষণাত্মক অবস্থানে থাকে। আর শক্তিমান জাতিগুলো সাধারণত আক্রমণাত্মক ও সম্প্রসারণমুখী হয়ে উঠে। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও জার্মানদের কথা উল্লেখ করা যায়। তবে জাতীয় শক্তি ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ স্বাধীনতার জন্যে যেমন অপরিহার্য, অধিক শক্তি ও উগ্র জাতীয়তাবাদ তেমনি অন্যের স্বাধীনতার জন্যে বিপজ্জনক। অতএব, সকল জাতির উন্নতি ও স্বাধীনতা সুরক্ষার লক্ষ্যে জাতীয় শক্তি ও জাতীয়তাবাদের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন।

'জাতীয় শক্তি, জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা' শীর্ষক ইউনিটের পাঠের বিষয়কে আমরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব :

- *পাঠ - ১ জাতীয়তাবাদের ধারণা।*
- *পাঠ - ২ জাতীয় শক্তি ও এর উপাদান।*
- *পাঠ - ৩ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ।*
- *পাঠ - ৪ স্বাধীনতা ও সাম্য।*
- *পাঠ - ৫ জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা।*

পাঠ - ১

জাতীয়তাবাদের ধারণা
(Concept of Nationalism)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা

বহুদিন ধরে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে আমরা সম্প্রদায়গত যে জীবনে এসে পৌঁছেছি তাকে বলা হয় জাতীয় সম্প্রদায়। এই জাতীয় সম্প্রদায়ের দু'টি দিক আছে: সামাজিক ও রাজনৈতিক। সামাজিক দিক থেকে জাতীয় সম্প্রদায়কে বলা হয় জাতীয় সমাজ (National Society) এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তা জাতি-রাষ্ট্র (National State) বলে অভিহিত হয়। জাতিরাষ্ট্রের ভাব বা আদর্শকে বলা হয় জাতীয় ভাব বা জাতীয়তাবাদ (Nationalism)। হ্যান্স কোঁ (Hans Kohn)-এর মতে, 'জাতীয়তাবাদ মূলত এবং প্রথমত একটি মানসিক অবস্থা, একটি চেতনা।' লাস্কি বলেছেন যে 'জাতীয়তাবাদ হল এক প্রকার মানসিক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ, যারা নিজেদেরকে বাকি মানব সমাজ হতে পৃথক মনে করে'। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, মানব জাতির কোন অংশ যদি পারস্পরিক সহানুভূতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়, পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের একাংশের দ্বারা পরিচালিত সরকারের অধীনে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তাহলে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠে। অধ্যাপক পাইডারের বক্তব্য অনুযায়ী, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে ইতিহাসের এক বিশেষ স্তরে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার ফল। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বসবাসকারী জনসাধারণের মানসিকতা ও ভাবগত ঐক্যই এর প্রধান শর্ত। এসকল সংজ্ঞাগুলা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতীয়তাবাদ হল কোন জনসমাজের মধ্যকার মানসিক অনুভূতি ও পারস্পরিক বন্ধনের চেতনা। এর ফলে তারা নিজেদেরকে অভিন্ন সত্ত্বার অধিকারী এবং অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের নেপথ্যে দু'টি শর্ত থাকে : (১) নিজেদের মধ্যে ঐক্যচেতনা এবং (২) অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধ।

ঐক্যবোধে আবদ্ধ এবং স্বাতন্ত্র্য চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ রাষ্ট্র গঠন করতে পারলে কিংবা রাষ্ট্র গঠনে সচেষ্ট হলেই জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। এ পরিস্থিতিতে কোন জনসমাজ নিজেদেরকে রোমান, খ্রিস্টান বা পাভিক হিসেবে বিবেচনা না করে আমেরিকান, ফরাসি বা রাশিয়ান হিসেবে ভাবতে শেখে । আর একারণেই আধুনিক জাতীয়তাবাদ সংকীনতা পরিহার করে রাষ্ট্রীয় পরিচিতি লাভ করে ।

জাতীয়তাবাদের উপাদানসমূহ

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, অনেকগুলো উপাদানের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। এসকল উপাদানগুলোকে বাহ্যিক এবং ভাবগত বা মানসিক-এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভৌগোলিক ঐক্য, বংশগত ঐক্য, ভাষা, এগুলো হল জাতীয়তাবাদের বাহ্যিক উপাদান। অপরদিকে ধর্ম, ঐতিহ্য চেতনা, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি মূলত: ভাবগত উপাদান। এই দুই ধরণের উপাদানই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে অপরিহার্য। তবে তুলনামূলক বিচারে ভাবগত উপাদানগুলোর প্রাধান্যই বেশি। এ পর্যায়ে আমরা জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ভৌগোলিক ঐক্য : ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তাবাদের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডে দীর্ঘকাল ধরে যদি কোন জনসমষ্টি বসবাস করে তাহলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে। একে অপরকে আপনজন বলে মনে করে।

স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্যের বন্ধন গড়ে ওঠে। একই ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণে সেই জনসমষ্টির মধ্যে নিজ ভূখন্ডের প্রতি অধিকারবোধ ও মমত্ববোধ গড়ে উঠে। এর ফলে মাতৃভূমির ধারণা প্রতিষ্ঠা পায় এবং মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে স্বাদেশিকতা জাগ্রত হয়।

বংশগত ঐক্য : জাতীয়তাবাদের একটি উপাদান হিসেবে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বংশগত ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কোন সঙ্ঘবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদের একই পূর্ব-পুরুষের বংশধর বলে মনে করে তখন তাদের মধ্যে এক সুদৃঢ় একাত্মতা-বোধ পরিলক্ষিত হয়। এই বংশগত ঐক্যের ধারণা গভীর জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটায়। কিন্তু আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বংশগত বিশুদ্ধতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। প্রতিটি জাতিই একাধিক বংশের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। এ কারণেই বংশগত ঐক্যকে জাতীয়তাবাদের অপরিহার্য উপাদান বলা যায় না। তবে জার্মানদের আর্যজাতির বংশধর রূপে প্রচার করে হিটলার জার্মানিতে ব্যাপক জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভাষাগত ঐক্য : মানুষের ভাব প্রকাশের সর্বপ্রধান মাধ্যম হল ভাষা। তার মাধ্যমেই মানুষ পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। ভাষার মাধ্যমেই তারা নিজেদের সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করে। যখন কোন জনসমাজের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য থাকে তখন তাদের মধ্যে একটি মানসিক একাত্মতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। ঐক্য দৃঢ়তর হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, যখন নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টির মধ্যে একটি ভাষা সার্বজনীনভাবে প্রচলিত থাকে তখন তাদের মধ্যে অতি সহজেই ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। ভাষা তখন তাদের জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। ভাষাকে কেন্দ্র করেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, ভাষাগত ঐক্যের অভাব জাতীয়তাবাদের অন্তরায় হয় না। সুইজারল্যান্ড এর প্রমাণ। সুইসরা বিভিন্ন ভাষাভাষী হয়েও এক জাতি।

ধর্মীয় ঐক্য : ধর্ম হল জাতীয়তাবাদের একটি ভাবগত উপাদান। জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা বিশেষ গুরডত্বের সাথে উল্লেখিত হয়। মধ্যযুগে ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হোত। আধুনিক কালেও জাতীয়তাবাদের বিকাশে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আরব জাতীয়তাবাদ মূলত ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। একই ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতি সহজেই ঐক্যের মানসিকতা গড়ে উঠে। অধ্যাপক গিলক্রিস্ট উল্লেখ করেছেন, ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য যেখানে প্রবল সেখানে জাতিগত ঐক্য স্বল্পস্থায়ী হতে বাধ্য। তবে জাতীয়তাবাদের বিকাশে ধর্ম অপরিহার্য উপাদান নয়। কেননা, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক আছে, কিন্তু বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা এক জাতি। চীনা, ভারতীয়, ফরাসী প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়েই গঠিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন : অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন জাতীয়তাবাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন এমন হওয়া প্রয়োজন যার মাধ্যমে জনসমাজের সবাইকে যেন ঐক্যবদ্ধ করা যায়। সমজাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের মাধ্যমেই কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা : রাজনৈতিক সংগঠন ও আশা- আকাঙ্ক্ষা জাতীয়তাবাদ গঠনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। কোন জনসমাজ দীর্ঘকাল ধরে একই ধরনের সরকারের অধীনে বসবাস করলে এবং একই ধরনের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এখানে ভাষা, ধর্ম কিংবা বংশগত পার্থক্য কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

ভাবগত ঐক্য : সুদীর্ঘকাল ধরে একই ভূখন্ডে বসবাস করলে কোন জনসমাজের মধ্যে সমজাতীয় ঐতিহ্য, জীবন ধারা, কৃষ্টি ও ইতিহাসের সমন্বয়ে এক ভাবগত বা আত্মিক ঐক্য গড়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞানী বার্নস উল্লেখ করেছেন, রক্তের অভিন্নতার তুলনায় একটি যৌথ স্মৃতি এবং যৌথ আদর্শ জাতি গঠনে অধিকতর সাহায্য করে। ভাষা, শিক্ষা- সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং আচার- আচরণগত ঐক্যের মাধ্যমেও ভাবগত ঐক্যের উন্মেষ ঘটে। ভাবগত ঐক্য কোন জনসমাজের মানসিক অবস্থাকে

প্রতিফলিত করে। সমজাতীয় অনুভূতি, চিন্তা এবং জীবন ধারণের পদ্ধতি নিয়ে ঐ মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই লাস্কী বলেছেন যে, 'জাতীয়তার ধারণা এক প্রকার মানসিক ধারণা।'

জাতীয়বাদের উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনার পর একথা বলা যায়, জাতি গঠনে কিংবা জাতীয়তাবাদের বিকাশে সকল উপাদানের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কোন একটি বা কয়েকটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে। তবে অন্তত: একটি উপাদানের প্রবল উপস্থিতি জাতীয়তাবাদ গঠনে অপরিহার্য।

সারকথা: মানসিক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজকে জাতি বলা হয়। কোন জাতির মধ্যকার আত্মচেতনাই হল জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উপাদান রয়েছে, যেমন- ভৌগোলিক ঐক্য, বংশগত ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা, ভাবগত ঐক্য ইত্যাদি। এসকল উপাদানের মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক উপাদান জনসমাজকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। সামাজিক দিক থেকে জাতীয় সম্প্রদায়কে কি বলা হয় ?

ক) জাতি রাষ্ট্র
খ) জাতীয় সমাজ
গ) পুর সমাজ
ঘ) পুর সম্প্রদায়।

২। হিটলার জার্মানদেরকে কোন্ জাতির বংশধর রূপে প্রচার করেছিলেন?

ক) পাভ
খ) রোমান
গ) আর্য
ঘ) সনাতন।

৩। 'জাতীয়তার ধারণা এক প্রকার মানসিক ধারণা'- এটা কার উক্তি?

ক) লাস্কি
খ) বার্নস
গ) রাসেল
ঘ) লিংকন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরুপন করুন।
২। জাতীয়তাবাদের বাহ্যিক ও ভাবগত উপাদানগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। জাতীয়তাবাদের উপাদান সমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা: ১.ক, ২. গ, ৩. ক।

সহায়ক গ্রন্থ:

L. I. Snyder, The Meaning of Nationalism.
A.F.K. Organaski, World Politics.

পাঠ - ২

জাতীয় শক্তি ও এর উপাদান
(National Power and It's Factors)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- জাতীয় শক্তি বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।

জাতীয় শক্তির সংজ্ঞা

জাতীয় শক্তির সংজ্ঞা নিরূপনের পূর্বে 'শক্তি' বলতে কি বুঝায় তা জানা দরকার। পদার্থবিদ্যায় শক্তি বলতে উহবৎমু, আর সামাজিক বিজ্ঞানে সামর্থ্য (Capacity) বুঝানো হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের পরিভাষায় শক্তি বলতে আমরা এমন এক ধরণের সামর্থ্য বুঝি, যার সাহায্যে কোন মানুষ অন্যের মন এবং কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। শক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জর্জ সোয়জেনবার্গার তাঁর 'Power Politics' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, শক্তি হল একজনের ইচ্ছাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা এবং যদি তারা সেটা মানতে না চায় তখন তাদেরকে তা মানতে বাধ্য করার সামর্থ।

'শক্তি' সম্পর্কে ধারণা পাবার পর আমরা জাতীয় শক্তির সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস পাবো। একথা ঠিক, শক্তিই হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চূড়ান্ত নির্ধারক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি জাতি কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা শক্তি দিয়েই বিচার করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, তার মূলে নিহিত আছে শক্তি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি জাতির অবস্থান কোথায় হবে এবং সে কী ভূমিকা পালন করবে, তা নির্ধারিত হয় ঐ জাতির শক্তির উপর। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে শক্তি ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা চিন্তা করা যায় না।

এখন দেখা যাক, জাতীয় শক্তি বলতে কি বুঝায়। অধ্যাপক লার্চের (Larche) মতে, জাতীয় শক্তির অর্থ হ'ল অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর কোন রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা এবং নিজের উপর অন্য রাষ্ট্রের অনুরূপ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাকে প্রতিহত করার সামর্থ। অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড এর মতে, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সকলপ্রকার ক্ষমতার যোগফলকেই জাতীয় শক্তি বলে অভিহিত করা যায়। এসকল সংজ্ঞার আলোকে এক কথায় বলা যায় যে, জাতীয় শক্তি হ'ল একটি রাষ্ট্র কর্তৃক তার জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতার যোগফল।

জাতীয় শক্তির উপাদান

জাতীয় শক্তি অনেকগুলো উপাদানের সমষ্টি। এদের মধ্যে কতকগুলো তুলনামূলকভাবে স্থায়ী আর বাকিগুলো প্রায়শ পরিবর্তনশীল। তবে জাতীয় শক্তি গঠনে এর প্রত্যেকটিই কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

তুলনামুলকভাবে স্থায়ী উপাদান :

১. ভৌগোলিক অবস্থান
২. প্রাকৃতিক সম্পদ
৩. শিল্পসামর্থ
৪. সামরিক প্রস্তুতি
৫. জনসংখ্যা।

অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী উপাদান :

১. জাতীয় চরিত্র ও মনোবল
২. সরকারের দক্ষতা
৩. কূটনৈতিক নৈপুণ্য।

ভৌগোলিক অবস্থা : সাধারণত: একটি দেশের অবস্থান, আয়তন ও ভূ-প্রকৃতির উপর সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থা নির্ভর করে। কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তার জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি অথবা খর্ব করতে পারে। মার্কিন যুওরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ হতে চতুর্দিক থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে বলে তার শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ কোন বৃহৎ শক্তি কখনও তাকে আক্রমণ করতে পারেনি। অনুরূপভাবে ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা মূল ইউরোপীয় ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ইংল্যান্ডের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। অপরদিকে হিমালয় ও ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থানের কারণে নেপালের জাতীয় শক্তি অনেকাংশেই খর্বিত হয়েছে।

ভূ-অবস্থানের পাশাপাশি কোন দেশের আয়তনও বিভিন্নভাবে জাতীয় শক্তি নির্ধারণে সাহায্য করে। প্রথমত, বিশাল ভূ-ভাগ বিপুল সংখ্যক মানুষের আবাসস্থল এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পদের সরবরাহ কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিশাল ভূ-ভাগ বৈদেশিক আক্রমণের সময়ে পশ্চাদপসরণের সুবিধা সৃষ্টি করে। এর ফলে সামরিক দিক থেকে অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নেয়া যায়। তৃতীয়ত, দেশের আয়তন বড় হলে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রকে সীমান্ত-অঞ্চল থেকে দূরে স্থাপন করা যায়। বৈদেশিক আক্রমণকারীর পক্ষে সেই দেশ দখল করে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং একথা বলা যায়, কোন দেশের আয়তন তার শক্তির সাথে সংশি- ষ্ট।

ভূ-অবস্থান ও ভূ-আয়তনের মতো ভূ- প্রকৃতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় নদী, পাহাড়, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি থাকলে তার প্রতিরক্ষা- ব্যবস্থা খুবই দৃঢ় থাকে। অপরপক্ষে সমতল ভূমির বিশাল সীমান্ত যে কোন সময়ে আক্রমণকারীর দখলে চলে যেতে পারে। অভ্যন্তরীণ ভূ-গঠনও জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে। সহজ চলাচল সম্ভব হলে জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা যতটুকু রক্ষা করা সম্ভব, দুর্গম এলাকায় ততটুকু সম্ভব নয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ : সাধারণভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৃত্তিকার উর্বরতা প্রভৃতিকে বুঝায়। কোন জাতির শক্তি ও সামর্থ সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে দুর্বল কোন দেশের পক্ষে খুব সহজে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা দরকার তার জন্য লোহা, এ্যালুমিনিয়াম, খনিজ তেল, রাবার, ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়া, আধুনিক শিল্প, যান্ত্রিক কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ও যাতায়াত এবং গণপূর্ত কার্যক্রমের জন্য খনিজ সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। কাজেই যেসকল দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ সেসকল দেশ খুব সহজে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে।

খনিজ সম্পদের মতো খাদ্য শস্য এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য দেশের শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সম্পদ ও বনজ সম্পদের অভাব স্বাভাবিক এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন দেশের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে। খাদ্যের ক্ষেত্রে চিরন্তন ঘাটতি জাতীয় শক্তি এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে অতীতের গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানি তার দৃষ্টান্ত। খাদ্যশস্যের দিক থেকে আত্মনির্ভরশীলতা জাতীয় শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধির সহায়ক। খাদ্যের ক্ষেত্রে কোন দেশের ঘাটতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার দুর্বলতারই প্রমাণ। যদিও খাদ্যসহ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন আধুনিককালে অনেকটাই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভূমির উর্বরতার গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়।

শিল্প সামর্থ : প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যতীত জাতীয় শক্তি যেমন অকল্পনীয় তেমনি শিল্প উৎপাদন ছাড়াও জাতীয় শক্তির কল্পনা ভিত্তিহীন। কঙ্গোতে প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম আছে। কিন্তু কঙ্গো আমেরিকা বা রাশিয়ার মত শক্তিশালী নয়। কারণ, কঙ্গোতে ইউরোনিয়াম ব্যবহার করার মত শিল্প বা কারখানা নেই। আবার ভারতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লোহা পাওয়া যায়। তথাপি ভারতকে বৃহৎ শক্তির মধ্যে গণ্য করা হয় না। কারণ, ভারতে সমস্ত খনিজ দ্রব্যকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করার মতো শিল্পের প্রসার ঘটেনি। তাছাড়া, বর্তমান যুগ অস্ত্র প্রতিযোগিতার যুগ। শিল্প সামর্থ না থাকলে জীবন যাত্রার

উচ্চমান অর্জন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়। কাজেই, শিল্প সামর্থ ছাড়া জাতীয় শক্তি অর্জন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

সামরিক প্রস্তুতি : জাতীয় শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক/উপাদান হচ্ছে সামরিক প্রস্তুতি। সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির পরিমাপ করা হয়। সামরিক ক্ষমতার ভিত্তিতেই 'পরাশক্তি' কিংবা 'প্রধান শক্তির ' প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কোন দেশের সামরিক প্রস্তুতি কতটুকু তা নির্ভর করে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যাগত ও গুণগত বিবেচনার উপর। স্থল, জল ও আকাশ সীমার নিরাপত্তা এবং এসকল ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য তাদের চেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্যের বাহিনী থাকা দরকার। শুধু অধিক সংখ্যার সশস্ত্র বাহিনীই নয়, তাদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জামও থাকতে হবে। এছাড়া, সামরিক নৈপুণ্য, সুযোগ্য সামরিক নেতৃত্ব এবং উচ্চ মনোবলের অধিকারী সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনী জাতীয় শক্তি অর্জনের জন্যে অপরিহার্য। তবে বর্তমান যুগে গতানুগতিক পদাতিক, নৌ এবং বিমান বাহিনীর শক্তির উপর সামরিক প্রস্তুতি সর্বাংশে নির্ভরশীল নয়। আনবিক অস্ত্র এবং আন্ত:মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রসহ কৌশলগত অস্ত্রভান্ডারের উপর জাতীয় শক্তি বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই যেসকল দেশ এ ধরনের অস্ত্র উৎপাদন ও তা ব্যবহার করায় যত বেশি সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে সেসকল দেশই হয়ে উঠবে তত বেশি শক্তিশালী।

জনসংখ্যা: জনসংখ্যা কোন দেশ বা জাতির গুরুত্বপূর্ণ শক্তি যদি সে জনসংখ্যা শিক্ষিত ও দক্ষ হয়। কিন্তু অশিক্ষিত ও অদক্ষ জনসংখ্যা অনেক সময় দেশের জন্যে বোঝা হয়ে উঠে। জনসংখ্যা দেশের প্রয়োজন ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সেই দেশের অগ্রগতি সহজসাধ্য হয়। একারণে কোন সম্পদশালী দেশে জনসংখ্যা কম থাকলে এজন্যে তাদের অগ্রগতি ব্যহত হতে পারে। জাতীয় শক্তি হিসেবে জনসংখ্যার গুরুত্ব এ কারণে যে, কম জনসংখ্যার কোন দেশের পক্ষেই বৃহৎ শক্তি হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। অধিক জনসংখ্যা বিভিন্ন দিক থেকে জাতীয় শক্তির পক্ষে সহায়ক হয়। যেমন প্রথমত, শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর জন্য জনবল প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশকে শত্রু সহজেই দখল করে নিতে পারে না। তৃতীয়ত, দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমশক্তির সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যও বেশি জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। চতুর্থত, অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্যেও অধিক জনেসংখ্যা অপরিহার্য।

জাতীয় চরিত্র ও মনোবল : জনসাধারণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মনোবলের উপর একটি দেশের জাতীয় শক্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। কোন জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে সচেতনতা থাকলে সে জাতি টিকে থাকতে ও এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে জাতি আত্মবিশ্বাসহীন, ভীরু এবং জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে অসচেতন, সে জাতি দুর্বল হয়ে থাকে ও সহজেই পরাভূত হয়। যুদ্ধ কিংবা যে কোন জাতীয় বিপর্যয়কালে জাতির মধ্যে যদি আত্মত্যাগের মানসিকতা এবং দৃঢ় মনোবল থাকে তাহলে সহজেই বিপর্যয় মোকাবেলা করা সম্ভব । শান্তিকালীন সময়েও উন্নত চরিত্র ও উচ্চ মনোবল জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বর্ধিত ভূমিকা পালনের সুযোগ বেড়ে যায়।

সরকারের দক্ষতা : সরকারের দক্ষতার উপর দেশের সংহতি, অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক অবস্থান বহুলাংশে নির্ভর করে। সরকার যদি সুদক্ষ হয় তাহলে জাতীয় শক্তির অন্যান্য উপাদানগুলোকে সমন্বিত করে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে। আর সরকার অদক্ষ হলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধিত হয় না। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা প্রসারিত করাও সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সরকারের কর্মকুশলতা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্যেই আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, চীন প্রভৃতি দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

কূটনৈতিক মান : জাতীয় শক্তি নির্ধারণে কূটনীতির ভূমিকা অপরিসীম। কূটনীতির মান উন্নত না হলে জাতীয় শক্তির অনেক উপাদানকেই কাজে লাগানো যায় না। আর কূটনীতির মান উন্নত হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়। এর ফলে অন্যের প্রভাব ঠেকানো এবং অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বেড়ে যায়। অর্থাৎ উচ্চমানের কূটনীতির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

জাতীয় শক্তির আলোচিত এ সকল উপাদানের মধ্যে সকল পরিস্থিতিতেই সকল উপাদানের গুরুত্ব সমান থাকে না। একেক সময়ে ও একেক পরিস্থিতিতে এক বা একাধিক উপাদানের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। তবে কোন উপাদানই কখনও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে না।

সারকথা আন্তর্জাতিক পরিসরে কোন রাষ্ট্র কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারবে তা নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তির উপর। জাতীয় শক্তির অর্থ হল অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর কোন রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা এবং নিজের উপর অন্য রাষ্ট্রের অনুরূপ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাকে প্রতিহত করার সামর্থ। জাতীয় শক্তির কতকগুলো স্থায়ী ও কতকগুলো অস্থায়ী উপাদান রয়েছে। তুলনামূলকভাবে স্থায়ী উপাদানগুলো হল- ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পাদ, শিল্পসামর্থ, সামরিক প্রস্তুতি ও জনসংখ্যা। অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী উপাদানগুলো হল-জাতীয় চরিত্র ও মনোবল, সরকারের দক্ষতা এবং কূটনৈতিক নৈপুণ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। সামাজিক বিজ্ঞানে শক্তি বলতে কি বুঝায় ?

ক) বল
খ) সামর্থ
গ) যোগ্যতা
ঘ) দক্ষতা।

২। জাতীয় শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক/উপাদান কোন্‌টি?

ক) সামরিক প্রস্তুতি
খ) জনসংখ্যা
গ) কুটনৈতিক মান
ঘ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

৩। কোন ক্ষমতার ভিত্তিতে 'পরাশক্তি' বা প্রধান শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটে?

ক) অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে
খ) সামরিক ক্ষমতার ভিত্তিতে
গ) কূটনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে
ঘ) প্রযুক্তিগত ক্ষমতার ভিত্তিতে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১। জাতীয় শক্তি বলতে আপনি কি বুঝেন?
২। জাতীয় শক্তির স্থায়ী উপাদান কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ, ৩. খ।

পাঠ - ৩

দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ
Patriotism and Nationalism

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদের ধারণা

নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার নামই দেশপ্রেম। আর জাতীয়তাবাদ হল একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার ঐক্যের অনুভূতি। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ উভয়ই মূলতঃ ভাবগত ধারণা।

দেশপ্রেম : দেশপ্রেম মূলত: একটি অনুভূতি, একটি ভাবগত ধারণা। নিজের দেশকে মানুষ তার পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি বলে মনে করে। কেননা, এ ভূমিই তার পূর্ব পুরুষের আবাসস্থল ছিল। এ ভূমিতে তারও জন্ম হয়েছে এবং এ ভূমির প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্য দিয়েই তার জীবনের বিকাশ ঘটে থাকে। এ কারণে নিজেদের দেশ নামক ভূখন্ডকে প্রত্যেকে তার জন্মভূমি হিসেবেও গণ্য করে। নিজের জন্মভূমির প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে। দেশের প্রতি তার মনে মমত্ববোধ বা ভালোবাসা জন্ম নেয়। এ মমত্ববোধ বা ভালোবাসার নামই হল দেশপ্রেম।

তবে দেশপ্রেমকে শুধু দেশের প্রতি বিমূর্ত আবেগ হিসেবেই গণ্য করা হয় না। দেশপ্রেমের কিছু বাস্তব উপাদান ও বস্তুগত ভিত্তি রয়েছে। দেশের নিরপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সচেষ্ট থাকা, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখায় সহায়তা করা এবং দেশের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নতি বিধানে কার্যকর ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম মূর্ত হয়ে উঠে। দেশের সম্পদ রক্ষা করা, দেশের আইন মান্য করা, দেশ বিরোধী তৎপরতা প্রতিহত করা এবং দেশের স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করা একজন দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব। মানুষ যেমন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকে, তেমনি তার কর্তব্য সম্পর্কেও সচতন থাকে। অধিকার ও কর্তব্যবোধের মধ্য দিয়েই দেশপ্রেমের বাস্তব ভিত্তি গড়ে ওঠে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেশের প্রতি অনুভূতি ও দেশের জন্যে কর্তব্য সম্পাদনের মানসিক প্রস্তুতিই হল দেশপ্রেম।

জাতীয়তাবাদ : জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেমের মতোই একটি ভাবগত ধারণা, একটি মানসিক অনুভূতি। যদি কোন একটি জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা নিজেদের রাজনৈতিক ইতিহাস, অতীতের স্মৃতি, ঐতিহ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মিল খুঁজে পায় তখন তাদের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি গড়ে ওঠে। ঐক্যের অনুভূতি বা ঐক্যসাধনকারী ধারণা থেকেই একটি জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করে। ঐক্য সাধনকারী জনগোষ্ঠী এক পর্যায়ে নিজেদের মধ্যকার সাদৃশ্য এবং অন্যের সাথে বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে তারা নিজেদেরকে অন্যান্য মানব গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন বলে ভাবতে শেখে। কোন জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে একাত্ম ও ঐক্যবদ্ধ হবার এবং অন্যদের থেকে নিজেদের ভিন্ন মনে করার ও পৃথক থাকার এই যে অনুভূতি বা প্রচেষ্টা প্রকৃত অর্থে সেটাই হল জাতীয়তাবাদ। তবে একটি জনগোষ্ঠী যদি নিজেদের জন্যে সুনির্দিষ্ট বাসভূমি গড়ে তুলতে না পারে কিংবা সে ব্যাপারে সচেতন ও সচেষ্ট না হয় তাহলে জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। অর্থাৎ কোন জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার সাথে জাতীয়তাবাদের ধারণা সম্পর্কযুক্ত। জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই মূলত: জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণতা লাভ করে। আধুনিককালে দেশ ও জাতি এ দু'টি প্রত্যয় অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। দেশ ছাড়া জাতি কিংবা জাতি ছাড়া দেশ কোনটাই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। একারণেই লাস্কি বলেছেন, মানুষের মধ্যে একত্রিত হয়ে বসবাস করার প্রবৃত্তি এবং নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রবণতা থেকেই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়।

দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক:

দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ নামক ধারণা দু'টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দেশপ্রেমের মানসিকতার কারণেই জাতীয়তাবাদের চেতনা গড়ে ওঠে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার ফলেই দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

কাজেই এ বিষয় দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জে. এইচ. হায়েসের মতে, জাতীয়তাবাদ হল জাতীয়তা ও দেশপ্রেম এ দু'টি আধুনিক অনাসক্ত বিষয়ের এক আবেগময় সমন্বয় ও অতিরঞ্জিতকরণ।

বস্তুতঃ কোন জনগোষ্ঠী একটি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিজেদের আশা-আঙ্ক্ষা এবং স্বাধীকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা থেকে নিজেদের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এ রাজনৈতিক সংগঠনই হল জাতি-রাষ্ট্র। একদিকে জাতি-রাষ্ট্র গড়ে তোলা, অন্যদিকে এই জাতি-রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা এবং তাকে বিকশিত করার জন্যেও জনসমষ্ঠীর মধ্যে তীব্র অনুভূতি জন্ম নেয়–যার নাম দেশপ্রেম। অপরদিকে, এক বা একাধিক কারণে যখন কোন জনসমাজের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি হয় তখন তারা প্রত্যেকে সুখ-দু:খ, ন্যায়-অন্যায়, মান-অপমানের সমান অংশীদার বলে ভাবতে থাকে। জনসমষ্টির মধ্যেকার সম্মিলিত ভাবনার সাথে দেশ- প্রেমের অনুভূতি যুক্ত হলেই রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ পরিপুষ্ট হয়। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের অনুভূতি থেকে দেশপ্রেমের অনুভূতি গড়ে ওঠে, আর দেশপ্রেমের অনুভূতি জাতীয়তাবাদকে পূর্ণতা দেয়। কাজেই এ বিষয় দু'টি একে অপরের পরিপুরক।

এখন আমরা জাতীয়তাবাদ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে দেশপ্রেমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। অধ্যাপক লুই সিন্ডার (Louis Synder) জাতীয়তাবাদ বিকাশের যে চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন তা হল :

১. ঐক্যসাধনকারী জাতীয়বাদ, যার সময়কাল ১৮১৫ থেকে ১৮৭১ সাল;
২. বিভেদকামী জাতীয়তাবাদ, যার সময়কাল ১৮৭১ থেকে ১৮৯০ সাল;
৩. আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, যার সময়কাল ১৯০০ থেকে ১৯৪৫ সাল এবং
৪. প্রতিক জাতীয়তাবাদ, ১৯৪৫ সাল থেকে যার সূচনা।

প্রথম পর্যায়ে ইতালি ও জার্মানির ঐক্যসাধনের প্রয়োজনীয়তা থেকে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সময়ে স্পেন ও ফ্রান্সের স্থিতিশীলতা ও সুশাসনের অভিজ্ঞতা এবং ইতালি-জার্মানির অস্থিতিশীলতা ও অপশাসনের প্রেক্ষাপটে যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল তা থেকেই জাতীয়তাবাদের চেতনা গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্যই বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে জাতি-রাষ্ট্র গড়ে তোলার অভিপ্রায় জেগে ওঠে যার মূল দেশপ্রেমের গভীরে নিহিত। তৃতীয় পর্যায়ে পরস্পর বিরোধী জাতীয় স্বার্থের ধারণা বা জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব থেকে যে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হল তার নেপথ্যেও ছিল উগ্র দেশপ্রেম। চতুর্থ পর্যায়ে বা সাম্পতিককালের জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক শাসন হতে মুক্তির লড়াই তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে যা উপনিবেশের জনসাধারণের তীব্র দেশেপ্রেমেরই ফলশ্রুতি।

এ আলোচনায় স্পষ্ট যে, বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে মূলতঃ দেশ প্রেমের অনুভূতির জন্যে। শুধু জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব রক্ষা তথা জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও দেশপ্রেম একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক শক্তি। দেশপ্রেমের অনুভূতি না থাকলে মানুষ ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে পরিচালিত হতো। ফলে জাতি-রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারতো না। দেশপ্রেমের কারণে মানুষ অনেক সময় ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে। এ কারণেই জাতীয়তার চেতনা কিংবা জাতি- রাষ্ট্রের ধারণা এখনও অবলুপ্ত হয়নি।

দেশপ্রেম জাতীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশপ্রেমের কারণে জাতীয় স্বাধীনতা টিকে থাকে এবং অন্যের আধিপত্য হতে নিজ জাতির আত্মরক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণে যে কোন জনসমাজ উদ্বুদ্ধ হয়। শুধু অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় অগ্রগতি অর্জন এবং জাতীয় মর্যাদা রক্ষায়ও জাতীয় জনসমাজ আগ্রহী হয়ে উঠে দেশপ্রেমের কারণেই। এ থেকে স্পষ্ট যে, জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার মূল চেতনাই হচ্ছে দেশপ্রেমের চেতনা।

এবার আমরা দেখবো জাতীয়তাবাদ কিভাবে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল হয়ে উঠলেই সেখানে গোষ্ঠীগত ও সম্প্রদায়গত

মনোভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হয়। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা দেশেপ্রমেরই অভিব্যক্তি।

এছাড়া, জাতীয়তাবাদী অনুভূতি যত তীব্র হয়ে উঠবে, মানুষ জাতি ও জাতি-রাষ্ট্রের ভাগ্যের সাথে নিজেকে তত বেশি সম্পৃক্ত করবে। এর ফলে নিজ দেশের প্রতি তার মমত্ব ও দায়িত্বের মাত্রাও স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যাবে। ব্যক্তি তখন সার্বিক জাতীয় স্বার্থে ভূমিকা পালনে আগ্রহী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ দেশের প্রতি মানুষের যে আনুগত্য এবং দেশের স্বার্থ রক্ষায় মানুষের যে প্রচেষ্টা তা জাতীয়তাবদী অনুভূতি থেকেই জন্ম নেয়। এছাড়া, দেশের সমস্ত মহৎ সৃষ্টি, প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের যে আগ্রহ ও ভালোবাসা তা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণেই জাগ্রত হয়।

পৃথিবীর যেসকল দেশে জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের সমন্বয় ঘটেছে সেসকল দেশে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি সে সকল দেশ বৈষয়িক দিক থেকেও ব্যপক উন্নতি করেছে। যেমন ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান। কিন্তু যে সকল দেশে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের সুসমন্বিত বিকাশ ঘটেনি সে সকল দেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বৈষয়িক দিক দিয়েও তারা সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে নি। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে সোমালিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করা যায়।

তবে একথাও ঠিক যে, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং উগ্র দেশপ্রেম অনেক সময় অন্য জাতি ও অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের আতিশয্য সমস্ত মানব সমাজকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের নামে সাম্রাজ্য বিস্তার এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বাসনা অন্যের দেশপ্রেমকে প্রচন্ডভাবে আঘাত করতে পারে। এ ধরণের ঘটনা ও পরিস্থিতি মানব সভ্যতার জন্যে হুমকিস্বরূপ। কাজেই কোন জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও দেশপ্রেম যাতে উগ্র রূপ লাভ না করে তা এক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয়।

জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক বিকাশ এবং দেশপ্রেমের ইতিবাচক প্রকাশই মানব সমাজ ও জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। এ ভিত্তি ভেঙ্গে পড়লে মানব সমাজ জাতীয় জনসমাজ হিসেবে যেমন টিকে থাকতে পারবে না, তেমনি জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থাও পাল্টে যাবে। বিশ্বব্যবস্থা বিন্যস্ত হবে নতুন ভাবে।

সারকথা:

দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ উভয়ই একটি ভাবগত ধারণা। কোন জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যকার ঐক্যের অনুভূতি থেকে জাতীয়তার জন্ম হয় এবং সেই জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র বা দেশ গঠনে অগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সেই দেশের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ বা মমত্ববোধ গড়ে ওঠে জাকে বলা হয় দেশপ্রেম। মূলত: জাতীয়তাবাদ হল জাতীয়তা ও দেশপ্রেম এ দুটি আধুনিক অনাসক্ত বিষয়ের এক আবেগময় সমন্বয় ও অতিরঞ্জিতকরণ। জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক বিকাশ মানুষের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ ক্ষতিকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। জে. এইচ. হায়েসের মতে জাতীয়তাবাদ কোন্ দু'টি বিষয়ের আবেগময় সমন্বয়?

ক) জাতীয়তা ও দেশপ্রেম
খ) রক্তের বন্ধন ও গোষ্ঠীচেতনা
গ) জাতীয়তা ও মানবিকতা
ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র।

২। ঐক্যসাধনকারী জাতীয়তাবাদের সময়কাল কোন্‌টি?

ক) ১৮১৫ থেকে ১৮৭১
খ) ১৮৭১ থেকে ১৮৯০
গ) ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৯।
ঘ) ১৯৮০-১৯৯৭।

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোন জাতীয়তাবাদ মানব সমাজকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলে?

ক) পাভ জাতীয়তাবাদ
খ) রোমান জাতীয়তাবাদ
গ) জার্মন জাতীয়তাবাদ
ঘ) ফরাসী জাতীয়তাবাদ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১। দেশপ্রেমের বাস্তব উপাদান ও বস্তুগত ভিত্তি কি কি?
২। লুই সিন্ডার-এর মতে জাতীয়তাবাদ বিকাশের পর্যায় কয়টি ও কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরুপন করুন।

উত্তারমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. গ।

স্বাধীনতা ও সাম্য
Liberty and Equality

পাঠ - ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা উল্লেখ করতে পারবেন।
- স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা

স্বাধীনতা : সাধারণ ভাষায় স্বাধীনতা বলতে মানুষের ইচ্ছামত বা মুক্তভাবে কোন কিছু করা বা না করার অবাধ অধিকারকে বুঝায়। এদিক থেকে অধীনতামুক্ত বা নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থাকে স্বাধীনতা বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এরূপ অধিকারের পরিস্থিতিকে স্বাধীনতা বলে গণ্য করা হয় না। কেননা, এ ধরনের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা কখনও এক হতে পারে না।

প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা হল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। সমাজে একত্রে বসবাস করতে হলে সকল মানুষকে আইনকানুন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন স্বাধীনতার অন্তরায় তো নয়ই, বরং রক্ষাকবচ। আইন বিবর্জিত অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা কখনও সভ্য সমাজের কাম্য হতে পারে না। স্বাধীনতার প্রকৃতিকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে স্বাধীনতার নেতিবাচক ও ইতিবাচক - দু'টি দিক পরিলক্ষিত হয়। নেতিবাচক দিক হতে, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অর্থাৎ অবাধে কাজ করার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলা হয়। অপরদিকে, ইতিবাচক দিক হতে, অপরের সমপরিমান অধিকার খর্ব না করে আইন অনুযায়ী ব্যক্তির স্বার্থ ও সুবিধা অর্জনের জন্য কাজ করার পরিবেশকেই স্বাধীনতা বলা হয়। লাস্কি বলেছেন, 'স্বাধীনতা বলতে আমি সেই পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণকে বুঝি, যেখানে ব্যক্তি তার প্রকৃত সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে'।

এ আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে, স্বাধীনতা বলতে এমন একটি পরিবেশকে বুঝায় যেখানে ব্যক্তিসত্তার সর্বোচ্চ বিকাশ হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত গুণাবলীর সর্বোচ্চ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিই হল স্বাধীনতা।

সাম্য : গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে ক্রমশ: এটি নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয় যে, রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনের চোখে সমান। কিন্তু বাস্তবে মানুষের মধ্যে দৈহিক গড়ন, মনোবল ও সামর্থের দিক দিয়ে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য যতদিন টিকে থাকবে ততদিন সকলে সমাজের নিকট থেকে সমান আচরণ আশা করতে পারে না। একজন প্রকৌশলী এবং একজন সাধারণ শ্রমিককে সমান মূল্য দেয়া হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য কথাটির অর্থ সকলে সমান হবে- এটি নয়।

মূলত: সাম্য বলতে সুষম পরিবেশ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকেই বুঝায়। এ পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুসারে অন্যান্যদের সঙ্গে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। লাস্কির মতে সাম্যের তিনটি অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। যথা প্রথমত: সাম্যের অর্থ হল বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অপসারণ। দ্বিতীয়ত: সাম্যের অর্থ হল সকল নাগরিকের জন্যে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা। সাম্য মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে সকলকে তাদের প্রতিভার পূর্ণবিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্তভাবে প্রদান করবে। সাম্য মানেই ধন-সম্পদ ও মর্যাদার পার্থক্যের সম্পূর্ণ দূরীকরণ বুঝায় না। তৃতীয়ত: যেগুলো ছাড়া মানুষের জীবন অর্থহীন, সেগুলোর শ্রেণী-নির্বিচারে মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং সাম্যের অর্থ হল আইনগতভাবে সকল ব্যক্তিকে সমান বলে বিবেচনা করা অর্থাৎ রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকগণের অধিকারসমূহ সমানভাবে বন্টন করা।

স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক

এককালে স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের এবং সাম্য সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হত। এ কারণেই দ্য টকভিল, এ্যাকটন প্রমুখ চিন্তাবিদ যারা স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন তারা সাম্যকে সমর্থন করেন নি। তাদের মতে, সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। এ্যাকটন বলেন যে, 'সাম্যের জন্যে ভাবাবেগ স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থতায় পর্যবসতি করে।' স্বাধীনতার মাধ্যমে যদি ধন ও ক্ষমতা অর্জনের অবাধ অধিকার পাওয়া যায় তাহলে একদল মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়বে, আরেক দল হবে দরিদ্র ও নি:স্ব। এ পরিস্থিতিতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর বিরোধী।

বাস্তবে স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে এরূপ কোন বিরোধ নেই, বরং উভয়েই পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীনতা সীমিত, সকলকে সমান আইনগত অধিকার ও মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে সাম্য স্বাধীনতাকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সাম্যনীতির প্রয়োগ অপরিহার্য। আইনের চোখে সমানাধিকার এবং শাসন-ব্যবস্থায় সমানভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ-ভোগের মাধ্যমেই জনগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে উপভোগ করতে পারে। আর, এইচ, টনি বলেন, " বহুল পরিমাণ সাম্য স্বাধীনতার বিরোধী হওয়া তো দূরের কথা বরং তা স্বাধীনতার পক্ষে অপরিহার্য।"

স্বাধীনতা ও সাম্য নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাম্য স্বাধীনতাকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। অপরদিকে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্যে সাম্য অপরিহার্য।

স্বাধীনতা ও সাম্যকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের উভয়েরই সাধারণ লক্ষ্য আাছে এবং তা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামর্থের স্বত:স্ফূর্ত ও পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। লাস্কি বলেন স্বাধীনতা "বলতে আমি এমন পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণকেই বুঝি, যেখানে মানুষ তাদের আত্মার সর্বোত্তম বিকাশ সাধন করতে পারে"। সাম্য নীতির বাস্তবায়নই এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। দেশের সংবিধানে লিখিত মৌলিক অধিকার সকলেই সমানভাবে ভোগ করবে, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ সকল নাগরিকেরই এ সকল অধিকারকে পূর্ণভাবে রক্ষা করবে। যদি স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ মানবাত্মার নিরবচ্ছিন্ন উন্নতিসাধন হয় তাহলে সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজে তা সম্ভব।। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে বৈষম্য দূর করা না হলে সেখানে আমরা সর্বদাই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক দেখতে পাব। যেকোন বৈষম্যপূর্ণ সামাজে ধনী-গরীবের উপর অবাধ শোষণ ও উৎপীড়ন চালিয়ে যাবে এবং সেখানে অধিকাংশ জনগণই কোন সমাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না। লাস্কির মতে"ধন-সম্পদের বিরাট বৈষম্য স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব করে তোলে"। সে জন্যে লাস্কির রুশোও মত বলেন যে 'সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার অর্থ নিরর্থক'। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় রূপায়িত হয়, আর স্বাধীনতা ছাড়া কোন সমাজের সাম্য আনতে হলে সেখানে একরূপতারই সৃষ্টি হয়।

এখানে বলা-বাহুল্য যে, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে অতি নিবিড় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতাকে সাম্যের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া উচিত। কারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যে প্রথমে স্বাধীনতারই প্রয়োজন, আর মানুষ যাতে সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে সে জন্যে সাম্য স্বাধীনতা উপভোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, স্বাধীনতার প্রয়োজন সাম্যই মেটাতে পারে। আবার সকলেই সাধারণভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে চায় বলে স্বাধীনতার নামে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু যদি কোন সমাজে কেবল সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, তাহলে ঐক্যের চেয়ে সেখানে বিভেদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যাহোক, ব্যক্তির সত্তার পরিপূর্ণ ও স্বত:স্ফুর্ত বিকাশের জন্য স্বাধীনতার যেমন প্রয়োজন, সাম্যেরও তেমন প্রয়োজন আছে। স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, একে অপরকে ছাড়া অর্থহীন।

বর্তমানে কোন রাষ্ট্রেই সাম্যবিহীন স্বাধীনতা অথবা স্বাধীনতাবিহীন সাম্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সাম্য এবং স্বাধীনতা উভয়ই আইনগত ধারণা এবং রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সংরক্ষিত। তবে সকল সমাজে সাম্য ও স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় নি। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যাপক ধনবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ধনবৈষম্য অপরিহার্য- ভাবেই সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। এ সমাজে সাম্য বলতে ধনিক শ্রেণীর সুযোগের সমতাকে বুঝায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই একমাত্র সাম্য ও স্বাধীনতার মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় হতে পারে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তাই বলা যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যের সুমমন্বয় বাস্তবে সম্ভব নয় - এটা সম্ভব শুধু আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্রে।

সারকথা:
স্বাধীনতা হল অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করে ব্যক্তির স্বার্থ ও সুবিধা অর্জনের পরিবেশ। অপরদিকে সাম্য হল রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা। মূলত: স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তিগত গুণাবলী বিকাশের, আর সাম্য বলতে সুষম পরিবেশ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকেই বুঝানো হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং উভয়ই পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। তবে একথাও ঠিক যে, স্বাধীনতা ও সাম্যের সুসমন্বয় বাস্তবে সম্ভব নয়-এটা সম্ভব শুধু আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ সমাজে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। মানুষের কোন কিছু করা বা না করার অবাধ অধিকারকে কি বলে ?

ক) স্বাধীনতা
খ) স্বেচ্ছাচারিতা
গ) সাম্য
ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

২। সুষম পরিবেশ গড়ে তোলার পরিবেশকে কি বলা হয়?

ক) উপযোগবাদ
খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
গ) উদারতাবাদ
ঘ) সাম্য।

৩। সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী -এ ধারণা কারা পোষণ করেন?

ক) দ্য টক্‌ভিল ও এ্যাকটন
খ) জন ও উইলিয়াম
গ) লাস্কি ও ম্যাকাইভার
ঘ) লিপসেট ও বল্ডউইন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন:

১। স্বাধীনতা বলতে কি বুঝেন?
২। সাম্য বলতে কি বুঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

উত্তারমালা: ১. খ. ২. গ, ৩. ক।

পাঠ - ৫

জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা
The Role of Citizen in National Defense

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতীয় প্রতিরক্ষা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকগণ কি ভূমিকা পালন করে থাকে বা করতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষার ধারণা

জাতীয় প্রতিরক্ষার সাথে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণা গভীরভাবে যুক্ত। জাতীয় নিরাপত্তার দুটি দিক: একটি অভ্যন্তরীণ, অন্যটি বহি:আক্রমণ সংক্রান্ত। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের বিদ্রোহ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও নাশকতামূলক তৎপরতা থেকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সংকট দেখা দিতে পারে। অপরদিকে, অন্য যে কোন দেশের আক্রমনজনিত কারনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কিংবা বহি: আক্রমণ যে কোন কারণেই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংকটাপন্ন কিংবা বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে । নিরাপত্তা সংকটের সকল ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে জাতী-রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। মুলত: ভৌগোলিক ও জাতিগত সংহতি রক্ষা এবং জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেবার জন্যে নৌ, সেনা ও বিমান বাহিনী সমেত যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় সংক্ষেপে তাকে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলা যায়। জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় নৌ,সেনা ও বিমান বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন সহায়তাকারী বাহিনী থাকে। মূল বাহিনী ও সহায়তাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব

জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি-স্বরূপ। যদিও সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদানের মতো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। এমনকি সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন না রাখতে পারলে রাষ্ট্রের অস্বিত্ব টিকিয়ে রাখা যায় না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যেমন সার্বভৌমত্বের উপর নির্ভরশীল, সার্বভৌমত্ব তেমনি জাতীয় প্রতিরক্ষার উপর নির্ভরশীল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় প্রতিরক্ষার উপর নির্ভর করেই টিকে থাকতে পারে।

যে কোন রাষ্ট্রেরই নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শক্তিশালী জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য।

আমরা জানি, সার্বভৌমত্বের দুটি দিক থাকে। এর একটি হল রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অপরটি হল দেশের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার সামর্থ। এই উভয় ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে জাতীয় প্রতিরক্ষা শক্তির উপর। জাতীয় প্রতিরক্ষা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না। এ কারণে প্রতিরক্ষা শক্তি ছাড়া রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় প্রতিরক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবনের পর অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাহিনী কি ধরনের ভূমিকা পালন করে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী শান্তির সময়ে, অভ্যন্তরীণ সংকটকালে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে ভিন্ন ধরনের ভূমিকা রাখে।

কান্তিকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে দেশের সীমানা পাহারা দেয়। এর ফলে দেশ ও জনগণ নিরাপত্তা ভীতি থেকে চিন্তা মুক্ত থাকে। অভ্যন্তরীণ সংকটকালে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিপন্ন হবার মতো পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা বাহিনী সিভিল প্রশাসনের সাথে একযোগে কাজ করে। যুদ্ধকালীন সময়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী তার পেশাদারী যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে শত্রুপক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর উল্লেখিত ভূমিকার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা

জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা আলোচনা করার প্রারম্ভেই 'নাগরিকতা' সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, নাগরিক হল রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, যারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। শুধু আনুগত্য প্রকাশই নাগরিকতার জন্য যথেষ্ট নয়, নাগরিকদের রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে নাগরিকদের ভূমিকাকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এ দুইভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা যায়।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকদের পরোক্ষ ভূমিকা হল :

১. নাগরিকগণ যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা করে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখে, তাহলে তা জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

২. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি নাগরিক সাধারণের সচেতনতা ও ব্যাপক আগ্রহ জাতীয় অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য করে রাখে—যা জাতীয় প্রতিরক্ষার মৌলিক ভিত্তি।

৩. সংকট কিংবা যুদ্ধকালে নাগরিকগণ জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতি নৈতিক সমর্থন এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীকে উৎসাহ প্রদান করতে পারে। এতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৪. সাধারণভাবে নাগরিকগণ কর ও রাজস্ব পরিশোধ করে এবং বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা কর প্রদান করে। নাগরিক সাধারণের কর হতে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও তাকে শক্তিশালী করা হয়। অর্থাৎ নাগরিকগণই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আর্থিক উৎস।

৫. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্যে সেনানিবাস গড়া, মহড়া অনুষ্ঠান কিংবা কোন ধরনের সামরিক পরীক্ষা মূলক কাজে নাগরিকগণ ভূমি হস্তান্তরসহ সার্বিক সহায়তা দিয়ে থাকে।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা হল :

জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকদের উল্লেখিত এ সকল পরোক্ষ ভূমিকা ছাড়াও প্রত্যক্ষ কিছু ভূমিকা রয়েছে। এগুলো হল-

১. নাগরিকদের মধ্য থেকেই প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়মিত সদস্যদের বাছাই ও নিয়োগ দেয়া হয়। অর্থাৎ নাগরিকদের মধ্য থেকে প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

২. দুর্যোগ কিংবা যুদ্ধকালে নাগরিকগণ নিয়মিত বাহিনীর সমর্থনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে যোগদান করে থাকে।

৩. যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের অবস্থান, চলাচল ও প্রস্তুতি সম্পর্কে কোন তথ্য পেলে সচেতন নাগরিকগণ প্রতিরক্ষা বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ তা জানিয়ে দিতে পারে।

৪. যুদ্ধের সময় নাগরিকগণ জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্যে রাস্তা, ব্রীজ ইত্যাদি পাহারার ব্যবস্থা করতে পারে।

৫. সামরিক বাহিনীর অবস্থান এবং সামরিক স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তার জন্যে নাগরিকগণ অনেক সময় মানব বেষ্টনী গড়ে তোলে ও 'মানব ঢাল' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬. যুদ্ধকালে বা জরুরি পরিস্থিতিতে নাগরিকগণ প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্যে খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি সরবরাহ করে এবং আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

৭. অনেক সময় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে গণ বাহিনী (Peoples Army) গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে নাগরিকগণ এ বাহিনীতে যোগদান করে।

৮. কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং দেয়া হয় যাতে প্রয়োজনে তারা সম্মুখ সমরেও অবতীর্ণ হতে পারে।

৯. যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার জ্ঞান অর্জন ও প্রযুক্তি আহরণের মাধ্যমে নাগরিকগণ "নিবারক ব্যবস্থা' গড়ে তুলতে পারে।

১০. সাধারণ নাগরিক সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত গঠন করে এবং গণবিক্ষোভ সংগঠিত করে প্রতিপক্ষের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারে। এর ফলে জাতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার কারণে নাগরিকগণ জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। নাগরিকদের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়া প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষে দেশের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। কাজেই জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকদের ভূমিকার গুরুত্বকে কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায় না।

সারকথাঃ

অভ্যন্তরীণ ও বহি:আক্রমণজনিত নিরাপত্তার প্রয়োজনে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিত রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শান্তিকালীন সময়ে দেশের ভেতরে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপন লড়াইয়ের মাধ্যমে দেশকে রক্ষা করা জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর মৌলিক দায়িত্ব। জাতীয় প্রতিরক্ষায় সাধারণ নাগরিকগণও সহযোগী শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কি কারণে নিরাপত্তা সংকট দেখা দেয়?

ক) আকাশ সীমা লংঘন
খ) তারকা যুদ্ধ কর্মসূচী
গ) বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন
ঘ) পারমানবিক কর্মসূচী।

২। সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার নির্ধারক শক্তি কোনটি?

ক) জাতীয় মূল্যবোধ
খ) জাতীয় প্রতিরক্ষা
গ) জাতীয় গণমাধ্যম
ঘ) জাতীয় সংস্কৃতি।

৩। যুদ্ধকালীন সময়ে 'নিবারক ব্যবস্থা' কারা গড়ে তুলেন?

ক) পদাতিক বাহিনী
খ) প্যারা মিলিটারী ফোর্স
গ) বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ
ঘ) নাগরিকগণ।

উত্তরঃ ১. গ, ২. ক, ৩. ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। জাতীয় প্রতিরক্ষা বলতে আপনি কি বুঝেন?
২। জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী শান্তি ও যুদ্ধের সময় কি ধরনের ভূমিকা রাখে?
৩। জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী যুদ্ধকালীন সময়ে কি ধরনের ভূমিকা রাখে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জাতীয় প্রতিরক্ষায় নাগরিকগণের ভূমিকা আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থঃ

SE Finer, The Man on Horseback: the Role of the Military in Politics (London: Pollmall Press, 1962)
Govin Kennedy, The Military in the third world (London: Gerald Duckworth, 19734)